সৌজন্যেঃ **স্বস্তিক ফার্মাসিউটিক্যাল**

পারিবারিক মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

অ্যাঞ্জেল

আপনার স্বাস্থ্য ও মননের সঙ্গী

ছোটদের শিক্ষনীয় মনোরঞ্জন অনুষ্ঠান

কলকাতা, জুন সংখ্যা, ১লা জুন , ২০১৯, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ শনিবার, একাদশতম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৪ পাতা, মূল্য ৪ টাকা

শৃঙ্খলার শৃঙ্খলই কী বিপদের কারণ... - ৩-এর পাতায় ✸ সান্দাকফু ভ্রমণ - ৪-এর পাতায় ✸ স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলিং - ৬-এর পাতায়

অম্বুবাচীর ইতিবৃত্ত

বিজ্ঞান যতই নিজের পথে অগ্রসর হয়ে যাক না কেন, এখনও পর্যন্ত মানুষের চিন্তাভাবনা বা তার অগ্রগতি তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আজও মেয়েদের রজঃস্রাব নিয়ে প্রচলিত আছে অফুরন্ত নিয়ম-কানুন। রজঃস্রাবের সময় ঘরের বাইরে বেরোনো যাবে না, কোন কাজ করা যাবে না, পূজো বা শুভ কাজে হাত দেওয়া যাবে না, আচার জাতীয় খাবারে হাত দেওয়া যাবে না, আরও কত কি। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দেখতে গেলে প্রত্যেকটাই ভিত্তিহীন। তবে সেই তৃতীয় বিশ্বেরই কোনও একদেশে দেবী রজঃস্রাবের সময়ই পূজিত হন। দেবীর রজঃস্রাবে ব্যবহৃত বস্ত্র প্রসাদ স্বরূপ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বই বা বড়োদের থেকে শোনা গল্পের দরুণ আমরা খুব ভালো করেই 'দক্ষযজ্ঞ' এবং সতীর সম্পর্ক এবং এরপর ঘটনাক্রমে চলা প্রত্যেক মুহূর্তই আমরা জানি। বিষ্ণুদেব নিজের চক্র দিয়ে সতীর দেহ ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেওয়ার পর সতীর দেহাংশ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পড়ে, সেই জায়গাগুলি সতীপীঠ নামে পরিচিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষের নীলাচল পর্বতে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির, বলা হয়, এখানেই মায়ের যোনির অংশ পড়েছিল। ৫১টি পীঠের মধ্যে এটি অন্যতম, এটি মহাপীঠ নামেও পরিচিত। এই মন্দিরকে জাগ্রত বলেও দাবি করা হয়। বলা হয়, এখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা বিজ্ঞানও উত্তর দিতে পারে না। বছরে তিনদিন কামাখ্যা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেই সময় মায়ের চারিদিক সাদা কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। তিনদিন পরে সেখানকার পুকুরের জল ও মায়ের সেই বস্ত্র লাল রঙ ধারণ করে। এই তিনদিন মায়ের রজঃস্রাব চলতে থাকে। তিনদিন পর যখন দরজা খোলা হয় তখন সেখানে লক্ষ-লক্ষ পূণ্যার্থী এসে জমা হন। ভক্তদের মধ্যে মায়ের লাল হয়ে যাওয়া সেই কাপড় প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। অম্বুবাচী মেলা চলতে থাকে টানা ৭দিন ধরে।

এই জায়গা ঘিরে যেমন অনেক রহস্য আছে, তেমন ছড়িয়ে আছে অনেক অজানা ইতিহাসও। এই মন্দিরটিতে মায়ের কোনও মূর্তি নেই, একটি স্তূপ আছে যা সারাবছরই ফুল দিয়ে ঢাকা থাকে। এটা নতুন মন্দির, ষোল'শো শতাব্দীতে কোচবিহারের রাজা বিশ্ব সিং তৈরী করেছিল।

মূল মন্দির বিলুপ্তির কারণ হিসাবে জানা যায় যে, নরক নামের একটি অসুর ছিল, যে দেবীকে বিবাহ করতে চায়, দেবী বলেছিল, কামাখ্যার এখানে অসুর নরক যদি মার্গ, মন্দির ও মাঠ একরাতে স্থাপন করতে পারে, তবে দেবী তাকে বিয়ে করবেন, সেইজন্য বিশ্বকর্মা নরকের কথা মতো কাজ শুরু করে। তবে দেবী বিবাহ না করার জন্য সকাল হওয়ার আগেই মুরগীর ডাক শুনিয়ে দিনের সূচনার কথা ঘোষণা করে দেন। ফলে বিবাহ পন্ড হয়। এই মন্দির প্রথমে কামদেব মন্দির হিসাবে প্রচলিত ছিল। বলা হয়, অসুর নরকের কারণে মন্দির যাওয়ার পথে কোনও না কোনও বাধা সৃষ্টি হত। তার জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠর অভিশাপে এই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই কোচবিহারের রাজার হাত ধরে নতুন মন্দির স্থাপিত হয়। এই মন্দির তান্ত্রিক ও সন্ন্যাসীদের কাছে অতি জনপ্রিয় সাধনার পীঠস্থান।

বন্ধুত্ব নয় সঙ্গী এখন একাকীত্ব !

বর্তমানে এই ব্যস্ততম যুগে পারিপার্শ্বিক চাপে একাকীত্বের জ্বালা বহন করে চলেছে আপনার সন্তানটিও। তাই সন্তানটি যখন আপনার, তখন তার সুস্থ ও সফল ভবিষ্যতের জন্য আপনাকেই সময় বের করে নিতে হবে। শুধু প্রতিষ্ঠিতই নয়, একাকীত্বহীন সুস্থ সফল ও স্বাভাবিক ভবিষ্যতই হোক নতুন প্রজন্মের লক্ষ্য - এই বিষয়ে জানালেন- **ডাঃ কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

অনুসূয়ার ছোটোবেলাটা কেটেছে ঠাকুমার কাছেই কারণ তার বাবা-মা দুজনেই বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন, ফলে সে শুধুমাত্র রবিবারটাতেই তার বাবা-মাকে কাছে পেত। বাবা-মার বকুনির হাত থেকে বাঁচানো এই ঠাকুমার কাছেই ছিল তার সবধরনের আবদার। অনুসূয়া তার ঠাকুমাকে ভালোবেসে ঠাম্মাম বলে ডাকতো। এই ঠাম্মাম রোজ তাকে নতুন নতুন গল্প শোনালেও, তার সব ছোটো-খাটো দুষ্টুমি, আবদার মেনে নিলেও সে কখনই তার মনের সব কথা বা স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের কথা বলতে পারতো না তার আদরের ঠাম্মামকে। সে যখনই তার মাকে কোনো কথা বলতে যেত তখনই তার মা তাকে শুধুই পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করতো এমনকি তার কোনো কথা শোনার মতো সময়ও তার কোনো দিনই ছিল না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঠাম্মাম বলতেন, 'বন্ধু নাও চিনে আর টাকা নাও গুনে' আবার তার মা বলতেন, 'মনে রেখো, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস আর অসৎ সঙ্গে নরক বাস', আবার স্কুলে টিচারদের কাছে সে শিখেছে "Never judge a book by its cover"। এই তিনটি প্রবাদ বাক্য ছোটো থেকেই শুনে এসেছে অনুসূয়া। সে যখনই কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে গেছে তখনই তার মা বারবার তাকে বন্ধুত্ব করতে বারণ করেছে, এমনকি এই জন্য তাকে কড়া শাসনেরও শিকার হতে হয়েছে। তার মায়ের মতে, 'স্কুলে যাচ্ছো পড়াশোনা করতে, সেখানে গিয়ে অন্য দশ জনের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট না করে মন দিয়ে পড়াশোনাটা করো। আর যার সাথে কথা বলছিলে সে কত নম্বর পেয়েছে পরীক্ষায়?' অনুসূয়া কখনই পড়াশোনায় খারাপ ছিলনা, সে পরীক্ষায় ৭০-৮০ শতাংশ নম্বর পেত; কিন্তু নম্বরটাই তো আর সব কিছু নয়। একদিকে ঠাম্মামের সাথে সে সব কথা বলতে পারছে না, অন্যদিকে বাবা-মায়েরও সময় নেই তার কোনো কথা শোনার আর যখনই সে কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে যায়, তখনই তাকে বাবা-মায়ের বকাবকি খেতে হয়। শুধু তাই নয়, সে যখন ডাইরি লিখত তখনও তাকে তার মায়ের কাছে বকা খেতে হতো; তার মা মনে করতেন, ডাইরি লিখলে সময় নষ্ট হয়, ওই সময়ে আরো ৪টে অঙ্ক করলে পরীক্ষার ফলাফলটা আরো ভালো হবে। এই সমস্যা এইভাবেই চলতে থাকে। অনুসূয়া একে একে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে আজ সে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। বাবা-মায়ের চাপেই প্রায় সে বাধ্য হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়। আজ তার পাশে কেউ নেই তাকে বোঝার মতো, তার সাথে দুটো মিনিট কথা বলার মতো বা তার কথা শোনার মতো। আজ প্রায় সাড়ে ৩ বছর হলো ঠাম্মামও গত হয়েছেন। অনুসূয়ার বাবা-মায়ের আজও তার সাথে কিছু মুহূর্ত কাটানোর মতো সময় নেই, কোনো বন্ধু-বান্ধবও নেই তার। কিন্তু তার মায়ের বক্তব্য বন্ধু-বান্ধব কেউই সারা জীবন পাশে থাকে না, থাকে শুধু পড়াশোনা করে পাওয়া ডিগ্রীগুলো। কিন্তু আজও অনুসূয়ার মা অন্তত মাসে একবার হলেও তার স্কুলের পুরোনো বন্ধুদের সাথে একটা গোটা দিন আড্ডা আর হইহুল্লোড় করে কাটিয়ে দেন। শুধু তার মা-ই নয় তার বাবাও ছুটি পেলেই ছোটবেলার বন্ধুদের নিয়ে গেট-টুগেদারে মেতে ওঠেন। আর অনুসূয়া পড়ে থাকে তার এই একাকীত্বকে সঙ্গী করেই আর একই সাথে এখন আবার উড়ে এসে জুড়ে বসেছে কলেজের ক্যাম্পাসিং; শুধু তাই নয়, বাড়ি থেকেও এম.টেক. করার চাপ। অনুসূয়ার এই নিঃসঙ্গ ও একাকীত্বের কথা শুনে মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তো! না, তা হওয়ার মতো কিছুই নেই। এখনকার এই নতুন প্রজন্মের কাছে প্রধান ও একমাত্র সঙ্গী হলো এই একাকীত্ব। এমন অনেক অভিভাবকই আছেন, যারা পরীক্ষার নম্বর বুঝে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা বিচার করেন। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পরীক্ষার নম্বর যতটা দরকার ঠিক তেমনই সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠারও খুব দরকার। দশজনের সাথে মেলামেশা, সব ধরণের পরিস্থিতিতে লড়াই করে টিকে থাকা, অন্যের বিপদে সবসময় এগিয়ে যাওয়া, এইগুলিও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়। কোনো মানুষই খারাপ নয়, প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু ভালো গুণ থাকে আবার কিছু খারাপ গুণও থাকে। তাই সন্তানদের সকলের সাথে মিশতে দিন, বেড়ে উঠতে দিন সকলের সাথে। আপনি শুধু আপনার সন্তানের বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে সচেতনে থাকুন, খেয়াল রাখুন যাতে সে খারাপ সঙ্গের সংস্পর্শে না যায় আর যদিও চলে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বকাবকি না করে ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করুন। যদি দেখেন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে তবে আর দেরি না করে অবশ্যই কোনো অভিজ্ঞ মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যতো দেরি করবেন ততই আপনার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়তে থাকবে। তাই যদি কোনো সমস্যা দেখেন বা হঠাৎ কোনো অভাবনীয় পরিবর্তন দেখেন তবে মনে কোনো সংকোচ না রেখে মনোরোগ চিকিৎসকের সঙ্গে আপনার সন্তানের বিষয়ে কথা বলুন। সন্তানের থেকে আশা করাটা ভুল নয়, কিন্তু সন্তান কি চায় তা না জেনে তার উপর একের পর এক বোঝা চাপিয়ে দেওয়াটাই তো সব থেকে বড়ো ভুল। বাচ্চাদের মন আর মস্তিষ্ক কোনোটাই তো আর প্রেশার কুকার নয় যে, সব কিছু একসাথে চাপিয়ে দিলেই সুস্বাদু খাবারের মতোই এক সুস্থ-সফল-সুপ্রতিষ্ঠিত সন্তান তৈরি হয়ে যাবে। তার জন্যই সকল অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন, বাচ্চাদের শাসন করুন কিন্তু অযথা কোনো কিছু চাপিয়ে দেবেন না। বাচ্চাদের মন ফুলের মতোই কোমল ও নিষ্পাপ, তাই একবার যদি সেই ফুল আহত হয় তবে সেই ক্ষত ঠিক হওয়াটা প্রায় অসম্ভব। বাচ্চারা ঠিক নরম মাটির ঢেলার মতো, যেমন আকার দেবেন তেমনই তৈরি হবে, তাই সন্তানটি যখন আপনার তখন তার সুস্থ ও সফল ভবিষ্যতের জন্য আপনাকেই সময় বের করে নিতে হবে। শুধু প্রতিষ্ঠিতই নয়, একাকীত্বহীন সুস্থ, সফল ও স্বাভাবিক ভবিষ্যতই হোক নতুন প্রজন্মের লক্ষ্য।

অ্যাঞ্জেল

একাদশতম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শনিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬, কলকাতা

সবার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হোক

ভালো স্বাস্থ্যই সুস্থ ও সতেজ জীবনের চাবিকাঠি। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণ মানুষের ভালো স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা যেমন দারিদ্রতা, তেমনি আরেকটা প্রধান বাধা সচেতনতার অভাব। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা এমন একটি বিষয়, যার ওপর একটি দেশের মানব সম্পদ অনেকাংশে নির্ভরশীল। নাগরিকের সুস্বাস্থ্যের অভাবে দেশের উৎপাদনশীলতা কমে, কমে যায় উন্নয়নের গতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের গুরুত্ব এখানেই।

সম্প্রতি হয়ে গেল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতি বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমন এমন একটি স্বাস্থ্য ইস্যু বেছে নেয়, যা বিশেষ করে সারা বিশ্বের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এবার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয় এ দিবসটি। ১৯৫০ সাল থেকে নিয়মিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বের নানা প্রান্তে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটিকে বিশ্বের বহু দেশ এবং বহু বেসরকারি সংগঠন পালন করে থাকে। মূলত, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ দিনটি কাজে লাগানো হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে আটটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচারমূলক কাজ করে থাকে, তার অন্যতম হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস।

তবে আমাদের দেশে বিপুল অর্থ ও সম্পদের সমাহার ঘটিয়ে এবং জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে 'সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা' এবং 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' সুরক্ষাসহ ২০৩০ সালের মধ্যে 'সব বয়সের এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত জীবন ও কল্যাণের মাত্রাকে বর্ধিত করার লক্ষ্য অর্জনের যে কথা বলা হচ্ছে, তা পূরণ করা সম্ভব হলে স্বাস্থ্য খাতে দেশের অগ্রগতির ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছবে বলে মনে করা যায়। আমাদের স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রবর্তন। অনেক জনবল নিয়োগ করার পরও যদি সেবাদান কেন্দ্রে চিকিৎসক ও সেবাদানকারীদের অনুপস্থিতির প্রবণতা প্রতিরোধ না করা যায় এবং সেবার গুণগত মান নিয়ে রোগী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ গড়া সম্ভব না হয়, তাহলে এখানে বিপুল সরকারি বিনিয়োগ অর্থহীন হবে এবং শতভাগ লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা বিরাজ করবে।

দেশের জনগণ এখনো স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য ৬৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেন নিজের পকেট থেকে। তাছাড়া এখনো গ্রাম-গঞ্জের মানুষ চিকিৎসার জন্য জলপড়া ও ওঝা-বৈদ্যদের শরণাপন্ন হচ্ছে। আর গ্রাম-গঞ্জের প্রসূতিরা আধুনিক প্রশিক্ষণবিহীন দাইদের পরিচালনায় নিজ বাড়িতে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সন্তান প্রসব করছে। এমনকি বহু ভুয়ো ডাক্তার দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাধীনভাবে এবং এসব ঘটছে প্রশাসনের লোকজনের সামনে অথবা তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে। আর এসব নিয়ে মাঝে মধ্যেই ধর-পাকড় হয়, কিন্তু তা সবই লোক দেখানো।

দেশে সহজে ও স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত। অনেকক্ষেত্রে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বন্ধু সুলভ নয়। এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবার পরিধির সঙ্গে সমন্বয় করে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটাতে হবে এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বচ্ছ কর্মসূচি নিতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার সাধনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাতিষ্ঠানিক সেবাকে জনপ্রিয় করা এবং হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে রোগী বান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, যেখানে ধনী ও গরীব সমান সেবার সুযোগ পাবে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সর্বত্র বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বিকল্প অর্থায়ন বা বীমার প্রচলন করতে হবে। এমনটাই প্রত্যাশা দেশবাসীর।

তাহাদের কথা

গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে আমরা পাড়াতে বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যখন আলোচনা করি তখন শুধু নতুন নতুন থিয়োরি বা সাধারণ ক্ষণস্থায়ী কিছু উপায় উঠে আসে, যা দিয়ে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়া গেলেও পুরোপুরি ভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারা যায় না। এই প্রতিবেদন থেকে এমনই একটি প্রাণীর কথা জানব, যা শত অভিযোজন করেও বিলুপ্তির পথে হারিয়ে গেছে। তেমনই একটি প্রাণী হল আচ্যাটিনেলা এপিক্সফিলভা প্রজাতির শামুক। এই জাতের শামুক বাকি প্রায় ৭৫০টি শামুক জাতির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো এবং সর্বপ্রথম জাতি। হাওয়াই দ্বীপে এদের সব থেকে বেশি দেখা যেত। হাওয়াই দ্বীপে এদের উত্থান হওয়া নিয়ে রয়েছে অনেক গল্প বা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন থিয়োরি।

বলা হয়, কোন এক পাখি শিকারের জন্য মুখে করে একটি গেছো শামুক তুলে উড়ে যাচ্ছিল। সেই পাখি সমুদ্র পার হওয়ার সময় ভুল করে শামুকটিকে মুখ থেকে পড়ে যায়। ফলে সেই শামুকটি সেখানে নিজের অভিযোজন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বেঁচে যায়। আবার অন্যদল বলে শামুকটি জলে ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগর পার করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে উঠে আসে।

এরা বিশেষত গাছের পাতা-ফল এসব খেয়ে বেঁচে থাকত। বিশেষত ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে জায়গাতেই থাকতে ভালোবাসে।

বাসস্থানের জন্য অপরিকল্পনীয়ভাবে গাছ কেটে ফেলার কারণে শত অভিযোজন করেও খাদ্য ও বাসস্থানের সংকট মেটাতে পারে না তারা। ফলে একে একে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। হাওয়াই দ্বীপ ছাড়াও ইউনাইডেট স্টেট্‌সে তাদের দেখা মিলত। কিন্তু সেখান থেকেও তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এমতো অবস্থায় হাওয়াই দ্বীপের ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যান্ড অ্যান্ড ন্যাচরাল রিসোর্সের তরফ থেকে এদের সংরক্ষণ করার কাজ শুরু করা হয়।

তারা আচ্যাটিনেলা এপিক্সফিলভা প্রজাতির শেষ শামুকটিকে তাদের রিসার্চ সেন্টারে রেখে দেখভাল করা শুরু করে। তার নাম রাখা হয় জর্জ। তার বয়স হয়ে গেছিল ১৫ বছর। একটি শামুক ১৫ বছর মানে তার যথেষ্ঠ বয়স হয়ে গেছিল। জর্জ একা এবং বয়স্ক হওয়ার কারণে তার থেকে নতুন কোন শামুকের জন্ম দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এরপরই ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারী হাওয়াইয়ের স্থানীয় সময় ভোর ৪টে ০৭ মিনিটে হাওয়াই দ্বীপের ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যান্ড অ্যান্ড ন্যাচরাল রিসোর্সের তরফ থেকে জানানো হয়, আচ্যাটিনেলা এপিক্সফিলভা প্রজাতির শেষ শামুক মারা গেছে। আমরা আর একটু সচেতন হলে বোধহয় এমনটা হত না।

ছায়াছবির অন্তরালে

জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোর সাথে জড়িয়ে থাকে অপেক্ষা এবং কিছু প্রত্যাশা। আর এদের জন্যই সৃষ্টি বিভিন্ন কল্পনার। এই কল্পনাগুলো কখনও আমাদের সেই বিশেষ মুহূর্তগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, আবার কখনও ঠিক একই কারণে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত হয়ে ওঠে অস্বস্তির কারণ। সেই অস্বস্তি এতটাই তীব্র যে, তার থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যুরও আশ্রয় নেওয়া সম্ভব। অতীব সাধারণ ভাষায় অতিরিক্ত কল্পনা, যার থেকে মৃত্যুও কাছের মনে হয়, সেই মানসিক অবস্থাকেই সিজোফ্রেনিয়া বলা হয়ে থাকে। সচরাচর কথা বললে, কোনো মানুষ এইরকম ভয়ঙ্কর মানসিক রোগে আক্রান্ত কিনা বোঝা যায় না। রোগীর কাছে থাকা মানুষগুলিই হতে থাকা সমস্যাগুলো বুঝতে পারে স্পষ্টভাবে।

এইরকমই মানসিক রোগের ওপর ভিত্তি করে বিজয় লালওয়ানির তৈরী 'কার্তিক কলিং কার্তিক' সিনেমাটি। এই সিনেমার মূখ্য ভূমিকায় দেখা গেছে ফারহান আখতার, দীপিকা পাড়ুকন, রাম কাপুর, শেফালি শাহ্, ভিপিন শর্মা প্রমুখ। ফারহান আখতারের চরিত্রের নাম কার্তিক নারায়ণ, আর সোনালী মুখার্জীর চরিত্রে দেখা গেছে দীপিকা পাড়ুকনকে। সিনেমাটিতে দেখা যায়, কার্তিক প্রবল আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে, ফলে কোনও কাজই স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারে না, তার অফিসের বস্ মিঃ কামাত (রাম কাপুর)। অফিস অনেক বড় না, মিডিওকার বলা যেতে পারে। অফিসে সমস্যা হলেই তার মনে হয় সে কোনও জালে জড়িয়ে গেছে। তার ছোটবেলার ঘটনায় বলা হয়েছে, তার বড় ভাই কুমার, তাকে প্রায়ই মারধর করত, সে বাড়ির বড়দের নালিশ করলেও লাভ হয়নি। একদিন কুমার, কার্তিককে কুয়োতে ফেলে দিতে গেলে, কার্তিক সরে যায়, আর তার দাদা কুয়োতে ডুবে মারা যায়। দাদার মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করে।

সোনালী, তার অফিসেই একসাথে কাজ করে। সোনালীর প্রতি তার একটা বিশেষ অনুভূতি আছে, যা তাকে বলে উঠতে পারে না।

কিছুদিন ধরে হঠাৎই ঠিক ভোর ৫টাতে কার্তিককে কোন এক অপরিচিত ফোন করছে এবং অফিসের সমস্যা, সোনালীকে অনুভূতিগুলো না বলতে পারার সমস্যাগুলো থেকে বাঁচার পথ বলছে। সেই আগুন্তুক ফোনের কথা কাউকে জানাতে বারণ করে। তারপরও সে তার ডাক্তার ও সোনালীকে গিয়ে বলে এবং এরপরই তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়, সোনালীর সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বন্ধ হয়। ফোনের হাত থেকে বাঁচতে সে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে। এমনকি নতুন জায়গায় গিয়ে ল্যান্ড ফোন ব্যবহার করাও বন্ধ করে দেয়। সব শেষে জানা যায়, কার্তিক সিজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত, ছোটবেলায় দাদার মৃত্যুটি সম্পূর্ণভাবেই তার মাথার মধ্যে তৈরী হওয়া একটা গল্প। এমনকি, উন্নতমানের টেলিফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেই সে নিজেকে নিজেই ফোন করত।

সোনালী এবং মনোবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিকিৎসার দরুণ কার্তিক সাধারণ জীবনে ফিরে আসে। সেই নতুন জীবনে সে জানে কিভাবে নিজের কল্পনাগুলোকে লাগাম দিতে হয়।

এই সিনেমা থেকে বোঝার বিষয় হল, সঠিক চিকিৎসা না পেলে যেকোনো গুরুতর অসুখ একটা মানুষকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে, আর সেখান থেকে রোগীকে সুস্থ করে ফিরিয়ে আনতে এক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন।

জামরুলের গুণাগুণ

গরমে তাপে আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হোক না কেন এই গরমের তাপের উপরই নির্ভর করে এই ফলের মিষ্টতা। কি অবাক হলেন তো? অবাক হবারই কথা। এই ফলের নাম হলো জামরুল, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম - Syzygium Samarangense। জামরুলের আদি বাসস্থান মালয়েশিয়া হলেও ভারতেও প্রচুর পরিমাণে জামরুল গাছ দেখতে পাওয়া যায় আর ফলনও যথেষ্ট পরিমাণে হয়। জলীয় এই ফলে প্রচুর পরিমাণে জল বা বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হলেও গরম যতো বাড়ে এই ফলও ঠিক ততোটাই মিষ্টি হয়। অত্যন্ত কম ক্যালোরিযুক্ত জলীয় এই ফলে ভিটামিন-বি ও সি, ডায়েটারি ফাইবার, আয়রন, সালফার, পটাশিয়াম ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম বিহীন হওয়ায় বহু রোগের দাওয়াই এই ফল। জামরুলে 'জাম্বোসিন' নামের একধরণের অ্যালকালয়েড থাকে যা অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধে সাহায্য করে। প্রতি ১০০ গ্রাম জামরুলে প্রায় ৯৩ গ্রাম জল, ৫.৭ মিলিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ০.৩ মিলিগ্রাম ফ্যাট, ০.৬ মিলিগ্রাম প্রোটিন, ২৯ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম, ১২৩ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ফাইবার, আয়রন, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

জামরুলের উপকারিতা

ডায়াবেটিস

কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম বিহীন জামরুলে জাম্বোসিন জাতীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতির কারণে রক্তশর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

অ্যাথেরোস্ক্লেরেসিস, হাইব্লাডপ্রেশার, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ

জামরুলে সোডিয়াম ও কোলেস্টেরল প্রায় নেই, ক্যালোরি বিহীন (২৫ ক্যালোরি/১০০ গ্রাম), ডায়েটারি ফাইবার, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন-বি ও সি সমৃদ্ধ হওয়ায় এক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী।

ডিহাইড্রেশন, হিটস্ট্রোক ও ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স

জলভরা পটাশিয়াম যুক্ত এই ফল মরশুমে নিয়মিত ব্রেকফাস্টে রাখা গেলে ডিহাইড্রেশন ও ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের আশঙ্কা কমে, ফলে এড়ানো যায় হিটস্ট্রোকের সম্ভাবনাও।

ইমিউন বুস্টার

জামরুলের ক্যারোটিনয়েডস ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ হওয়ায় বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

এছাড়া ফাঙ্গাল ও ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ, জ্বর, মৃগীরোগ, সন্ধিস্থলের প্রদাহ, বদহজম, জন্ডিস, স্মৃতিহ্রাস ইত্যাদি বহুরোগের পথ্যেই জামরুল রাখতে পারেন নির্ভয়ে। অতএব নিজেকে সুস্থ ও তরতাজা রাখতে আর দেরি না করে এবার থেকে প্রায় রোজই নিজের খাদ্য তালিকায় এই ফলটি রাখুন।

শৃঙ্খলার শৃঙ্খলই কী বিপদের কারণ ?

ডঃ তন্ময় মিত্র, বিশিষ্ট সাইকোলজিস্ট

আমরা এমন অনেকেই চিনি যারা ছোট থেকে অতিরিক্ত নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে। সকাল ৫টায় ঘুম থেকে উঠে ব্যায়াম করা, তারপর হালকা কিছু খেয়ে পড়তে বসা, স্নান করে দুপুরের খাওয়া, তারপর একটু খেলাধূলা বা টিউশন পড়া, আবার রাতের খাবার ৮টার মধ্যে শেষ করে ১০টায় ঘুমিয়ে পড়া। এই অভ্যাসটা খুবই ভালো এবং বলাই বাহুল্য স্বাস্থ্যকরও বটে। আবার অনেক বাড়িতে দেখা যায়, খেতে বসে খাওয়া শুরু করার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন তারপর খাওয়া শুরু করছেন। এই কথাগুলো নিয়ে কোথাও বিশেষ কোনও মতবিরোধ নেই।

তবে এইসব ক্ষেত্রে সমস্যা শুরু হয় বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায়। অতিরিক্ত নিয়মশৃঙ্খলা ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ সেটা সবাই মন থেকে মেনে নিচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, ভোর ৫টাতে জোর করে বাচ্চাদের তুলে ব্যায়াম করানো বা কোনো কাজের মধ্যে রাখা হচ্ছে। হয়তো সেই সময় শিশুটির আরো কিছুক্ষণ ঘুমের প্রয়োজন। কারণ একটা বয়স পর্যন্ত বাচ্চারা যত বেশি ঘুমাবে তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ তত ভালো হবে।

এখন পড়াশোনার পদ্ধতিতে খেয়াল করলে দেখবেন, বাচ্চাদের স্কুল থেকে অসংখ্যা হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়। এমনকি তাদের স্কুলে সমস্ত বইও টেনে টেনে নিয়ে যেতে হয়। হোমওর্য়াক গুলো মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে করতে হয়। তাই তারা খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যায়। আর সারাদিন পিঠে ভারী ব্যাগের বোঝা টানতে গিয়ে পিঠে, কোমরে আর কাঁধেও তাদের অসম্ভব ব্যথা হয়। এমন পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠা বাচ্চাদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সকালবেলা তাদের আর একটু ঘুমের প্রয়োজন হয়। সারাদিন বইখাতা, আর পড়াশোনার পর বিকেল বেলা একটু খেলাধূলারও প্রয়োজন হয়। সেই খেলাধূলার মধ্যে দিয়েই বাচ্চাদের ব্যায়ামের কাজ সম্পন্ন হয়। সেই সময় যদি আবার টিউশনে পাঠানো হয় বা বাড়ির শিক্ষক এসে পড়তে বসায়, তাহলে তখন আর পড়াশোনা কিছু হয় না। শুধু বাড়ির লোকের ভালোবাসাটাকে ভুল বুঝতে থাকে বাড়ির ছোট ছোট শিশুগুলো। ভেতরে একরাশ অভিমান জমে যায়। তখন মনে করে বাড়ির চেয়ে হোস্টেল অনেক বেশি ভালো।

বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই নিয়মশৃঙ্খলার অতিরিক্তি টানাপোড়েনের কারণে ছোটদের স্বাধীনতাগুলো কমে যায়। যেমন ধরুন- ছোটবেলায় বন্ধুতে বন্ধুতে ঝগড়া হল। হঠাৎই মাঝখান থেকে বাড়ির বড়রা ছোটদেরকে বোঝাল বাকি বাচ্চারা খারাপ, তাদের সাথে না মিশে বাড়িতে বই পড়া অনেক ভালো। হয়তো সেই বাচ্চাটি ঝগড়ার মধ্যেও ছিল না। বন্ধুরা ঝগড়া করছিল সে সেখানে উপস্থিত ছিল। একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হওয়ার দরুন যদি দেখেন আপনার বন্ধুরা এইভাবে ঝগড়া করছে, স্বভাবতই আপনি দুজনকেই বুঝিয়ে ঝগড়াটা মিটিয়ে দেবেন, নাকি আপনি দুজনের সাথে কথা বলা বা যোগাযোগ রাখা বন্ধ করে দেবেন। এটা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কিন্তু বাচ্চাদের ছোটবেলায় এসব কাজ করতে দেওয়া হয় না। ফলে তারা বন্ধু বানানোর সময়, বন্ধু হারিয়ে ফেলে। চরম একাকীত্বে তারা ভুগতে শুরু করে। কারণ দেখতে গেলে বাচ্চাগুলো নিজের বয়সী কারোর সাথেই মিলেমিশে বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই এখন প্রায়ই দেখা যায় বাচ্চারা রেগে গেলে বড়দের মতো ব্যবহার করে। বাচ্চাদের কিছু বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না। মুখে বড়দের মতো কথা বলা ছাড়াও বড়দের মতো কাজ তারা করে থাকে। রাগ করে নিজেকে ঘরে বন্দী করা বা খেতে না চাওয়া, এগুলো প্রথম প্রথম অস্বাভাবিক মনে হলেও এর পিছনে মূল কারণ হয়ে থাকে অতিরিক্ত নিয়মের বেড়াজাল। খুব কমক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বাচ্চারা বাড়িতে খাওয়ার আগে প্রার্থনা করে কিন্তু তারা বাইরে বেরিয়েও একইভাবে খাওয়ার আগে প্রার্থনা করে না। যদি বাচ্চাটি ছোট থেকেই ভালোবেসে, ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকত খাবার পাওয়ার জন্য, তাহলে সে বাড়ির বাইরেও একই ভাবে ভগবানের কাছে খাবার আগে প্রার্থনা করতো। তাতে শিশুটির কোন দ্বিধা বোধ থাকতো না।

ছোটবেলা থেকেই খেলা বলতে ক্রিকেট-ফুটবল আর নয়তো গুচ্ছ গুচ্ছ বইয়ের মাঝে বড় হওয়া। এত পড়াশোনার পরও যদি বাচ্চারা ভালো রেজাল্ট করতে না পারে, পাড়ার লোক বা আত্মীয়স্বজন অথবা স্বয়ং অভিভাবকদের তুলনায় অনেকবেশী কষ্ট বাচ্চারাই পায়। কিন্তু বকা খাওয়ার ভয়ে নিজেদের অনুভূতিগুলো কাউকে বুঝিয়ে উঠতে পারে না। একদিকে অতিরিক্ত পড়াশোনা, বাড়ির নিয়ম-কানুন তাকে বাহ্যিক জ্ঞানহীন রোবটে পরিণত করে অন্যদিকে, তার মন স্বীকৃতি চায়। একটু সে শুনতে চায় তার কাছের লোকগুলো তাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই যেখানে ভুলগুলো লাল রঙ দিয়ে দাগিয়ে, বকা দেওয়া ছাড়া এমন কেউ নেই যে বাচ্চাদেরকে বাহবা দেবে তার কিন্তু নির্ভুল লেখার জন্য। এখানে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করেই ঠিক হয় একটি বাচ্চার জ্ঞানের পরিধি। হয়তো যে বাচ্চাটা অনেক নম্বর পায়, তার বাহ্যিক জ্ঞানটাই নেই। তবুও সে সেরা কারণ সে বেশি নম্বর পাচ্ছে। যখনই এইরকম হয়, শুধু মাত্র পড়ার বই মুখস্থ করে বা লিখে নম্বর পাওয়া যায় না, তখন বাড়ির লোক কোন পথ না পেয়ে তাবিজ, কবজ, আংটি, ঠাকুর দেবতার ওপর অন্ধ বিশ্বাস করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, শিশুটিকে তাই শেখায়। পরীক্ষা দেওয়ার আগে পূজো দিতে, দুই শালিক দেখে তারপর পরীক্ষা দিতে যেতে, তাতে নাকি পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়। একবারও তারা চিন্তা করেন না, বাচ্চারাও কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে। দুই শালিক প্রণাম করার সাথে অঙ্ক পরীক্ষার কোনও যোগ নেই। নিজের সন্তানকে যদি আপনি অনুপ্রেরিত করতে পারেন, বোঝাতে পারেন পড়াশোনা কেন জরুরী। যদি এটা বোঝাতে পারে মুখস্থ বিদ্যার ফলে পাওয়া নম্বরের চেয়ে বাহ্যিক জ্ঞান অনেক ভালো, তাহলে আপনার শিশু সফলতা অর্জন করবে ভবিষ্যতে।

নিজের সন্তানকে অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে আটকে দেওয়ার পর আপনার মনে হয় বড় হয়ে আমার সন্তান কোনও ঠাকুর দেবতা মানে না, রাতে ঘুমায় না, সকালে ওঠে না, খাওয়ার কোনও ঠিকঠিকানা নেই, নিজের ইচ্ছে মতো উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছে। বাবা-মা হিসাবে সন্তানের দিকে আঙুল তোলার আগে গোড়াতেই নিজেদের ভুলগুলো সংশোধন করে ফেলুন। কারণ, বাচ্চারা যখনই বুঝবে ভগবানকে ডেকেও নম্বর বেশি পায়নি, সে নিজের বিশ্বাস হারাবে ভগবানের ওপর। তখন বাড়ির অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক। সময় মতো ঘুমিয়ে বা সময় মতো উঠেও যদি জীবনে সফলতা অর্জনের পথে হাজার বাধা আসে, বাচ্চারা বড় হওয়ার সাথে সাথেই বুঝে যাবে ঘুমানোর সময়ের ওপর ভিত্তি করে কোনও কিছুই অর্জন করা যায় না। তখনই তার ঘুমের সময়, খাবার সময় পাল্টে যাবে। খাওয়ার আগে প্রার্থনা তার মাথা থেকেই বেরিয়ে যাবে। আর যখনই আপনি এগুলো নিজের চোখে দেখবেন তখন আপনার মনে হবে এটা বেপরোয়া জীবনযাপন। যেখানে নেই কোন নিয়ম, নেই কোন শৃঙ্খলা। এরপরই আপনার সন্তানের সাথে আপনার মতের অমিল হবে ও সমস্যা শুরু হবে। জমতে থাকা ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি নষ্ট করবে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক।

অনেকক্ষেত্রেই মনোবিদদের কাছে এরকমই একরাশ হতাশা, খারাপ লাগা এবং নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে শিশুকে বড় করার পরও তার বেপরোয়া হয়ে যাওয়া নিয়ে বাবা-মায়েরা উপস্থিত হন। সময় থাকতেই একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক হওয়ার দরুন এসব সমস্যাগুলো হওয়ার থেকে আটকাতে পারেন ছোটবেলা থেকেই। সন্তানকে অতিরিক্ত নিয়মের গন্ডিতে আটকানো বন্ধ করুন, সব সময় তাদের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবেন না, যেকোনো কাজ করার সময়ই তাকে বোঝান কেন কাজটা তার জন্য জরুরী, তাকে সব সময় চোখে আঙুল দিয়ে ভুলটা দেখিয়ে দেবেন না, তার ভালো কাজের জন্য বাহবা দিন, তাকে সবার সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দিন, সব সময় নিজে তাকে ঠিক ও ভুল বোঝাতে যাবেন না। মাঝে মাঝে শিশুটিকে একা বুঝে নিতে দিন, শিশুটির পাশে থাকুন তার নির্ভরতার জায়গা হয়ে শুধু সর্বদা অবলম্বন হয়ে নয়।

এরপরও যদি কোনও সমস্যা হয়, যেকোনো বয়সে সরাসরি মনোবিদদের সাথে যোগাযোগ করুন। তারা অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করবেন সঠিক চিকিৎসার মধ্য দিয়ে।

দূরে কোথাও

মায়ার দেশ সান্দাকফু

ট্রেকিং লাভার্সরা এখনও সান্দাকফু ট্রেক করেননি এমন কেউ আছেন নাকি? বোধ হয় নেই। একটা সময় ছিল সুখী বাঙালি সান্দাকফুতে পৌঁছবার কষ্ট সহ্য হজম করা পছন্দ করতেন না। এখন সময় বদলেছে। গড়পড়তা বাঙালি পর্যটকরাও স্বাদ বদলাতে যেতে পারেন সান্দাকফুতে। এক জীবনে এই সময়ের বেশি কিছু আপনি দিতে পারবেন না আপনার পাঁচ বছরের বাচ্চাটাকে। আঁতকে উঠবেন না। এখন আপনার সঙ্গী হতে পারে পাঁচ বছরের শিশু কন্যাটিও।

পায়ে যদি বল আর মনে যদি জোর থাকে তবে চলুন পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষবিন্দু সান্দাকফু (৩৬৫৮ মিটার)। বলা যায় না, হয়তো বরফের স্পর্শও পেয়ে যেতে পারেন। দার্জিলিং থেকে দূরত্ব ৫৮ কিলোমিটার। যদিও আজকাল হাজার তিনেক টাকায় ল্যান্ডরোভারে দার্জিলিং থেকে সান্দাকফু যাওয়া যায়। তবু বলব গাড়িতে এপথে না যাওয়াই ভাল। রাস্তা বন্ধুর, গাড়ির পক্ষে মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। গাড়িতে গেলে এমন ঝাঁকুনি লাগবে যে, বিশ্বকবির মতোই আপনার মনেও আশঙ্কা জাগবে-দেহের রসরক্ত মাখন হয়ে না বেরিয়ে যায়! আর সারাটা বছরই তো গাড়ি চড়ে হিল্লি-দিল্লি করছেন, তাই যদি পারেন হেঁটেই চলুন না এই মায়ার দেশে। যাওয়ার সেরা সময় মার্চ-এপ্রিল। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরে গেলেও মন্দ লাগবে না।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এর পথে ঘুম-এ নেমে বাস বা জিপে সুকিয়াপোখরি হয়ে নেপাল সীমান্তে বাংলার ছোট্ট গ্রাম মানেভঞ্জন (২১৩৪ মিটার)। হোটেলে মালপত্র রেখে গাইড ঠিক করে ফেলুন। আগে গাইড ছাড়াই চলে যাওয়া যেত। এখন সরকারি নিয়মানুসারে সিঙ্গালীলা রাষ্ট্রীয় উদ্যানে প্রবেশ করলে প্রতি সাতজনের জন্য বনবিভাগ স্বীকৃত একজন গাইড নিতেই হবে। গাইডের খরচ মোটামুটি খাওয়া ছাড়া ৫০০ টাকা ও খাবার নিলে ৩০০ টাকা প্রতিদিন। মানেভঞ্জনের বাজারে শেষ মুহূর্তের টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে নিন। বাদাম, লজেন্স, বিস্কুট, জলের বোতল নিতে ভুলবেন না কিন্তু।

পরদিন সকাল সকাল রওনা দিন। শীত শীত সকালে রোদ মেখে হাঁটতে ভালই লাগবে। পথ কখনও নেপাল, কখনও বাংলার ভিতর দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলে গেছে সান্দাকফু-র দিকে। যদিও একদিনেই গৈরিবাস যাওয়া যায়, অত ধকল না নিয়ে আজ রাতটা থাকুন টুংলুতে। ভাল লাগবে। চিত্রে, লামিধুরা পেরিয়ে শুরু হবে চড়াই। পাখির কাকলির তালে তালে জংলি পথে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে নেপালি গ্রাম মেঘনা (২৮৯৫ মিটার) পৌঁছে গেছেন টেরই পাবেন না। এখান থেকে দু'দিকে দু'টি রাস্তা গেছে। আপনি ডানহাতি টুংলুর (৩০৭০ মিটার) পথটিই ধরুন। দু'কিলোমিটার চড়াই ভেঙে উঠে আসুন হিল কাউন্সিলের ট্রেকার্স হাটে। কাচের জানলায় মুখ রেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মেঘ সাগরের ওপারে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দিনের শেষে পাহাড় চূড়ায় রঙ ছড়িয়ে বিদায় নেবেন দিবাকর। সন্ধে নামবে টুংলু পাহাড়ে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দেখবেন দূরে দার্জিলিং পাহাড়ে জ্বলে উঠেছে ঝিকিমিকি আলো। স্তব্ধতার গান শুনতে শুনতে সন্ধে গড়াবে রাতের কোলে।

সকালে আবার হাঁটা। উৎরাই বেয়ে তুমলিং-এ নেমে নেপালের পথ ধরে জেটবাড়ি। গ্রামে ঢুকতেই মনি দেওয়াল, চোর্তেন, দুর্গা মন্দির। আবার তরতরিয়ে নামা। খানিক বাদেই পৌঁছবেন অরণ্য ছাওয়া গৈরিবাস (২৬৮২ মিটার)। সিঙ্গালীলা ন্যাশনাল পার্ক এখানেই শুরু। চেকপোস্টে ২০ টাকা প্রবেশ মূল্য দিয়ে বিস্কুট, জল খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা। কৈয়াকাটা পেরিয়ে কালাপোখরি (৩১৭০ মিটার) মানে কালো জলের পুকুর। এখানে নাকি কাল নাগের বাসস্থান। টলটলে কালো জলের পুকুর, চারপাশে রঙিন পতাকা উড়ছে। অনেক হেঁটেছেন, আজ আর হাঁটতে হবে না। এখানে অনেক থাকার জায়গা আছে। যে কোনও একটিতে রাতের আশ্রয় নিন।

সকাল থেকেই মনে উত্তেজনা! আজই পৌঁছবেন সেই স্বপ্নের দেশে। গুড়াস জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রঙিন প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে চার কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছাবেন সান্দাকফু পাহাড়ের ঠিক নিচেই বিকেভজনে। শেষ চড়াইটুকু ওঠার আগে পেটে জ্বালানি ভরে নিন। সাথাং ছেকির দোকানে চা-জলখাবার খেয়ে নেমে আসুন পথে। ধীরে-সুস্থে এগিয়ে চলুন কষ্টকর এই শেষ চার কিলোমিটার পথ। হাঁফ ধরবে। কিন্তু ম্যাপেল, ওক, বার্চ, সিলভার, ফার আর গুড়াসের জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘ কুয়াশা চিরে পান্ডিম, সিনিয়লচু, কাঞ্চনজঙ্ঘার দুষ্টু মিষ্টি হাসি আর পথের ধারে ধারে বরফ দেখতে দেখতে ভুলে যাবেন চড়াই ভাঙার কষ্ট। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরেই মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন কিছুক্ষণ। পৌঁছে যাবেন সান্দাকফু। সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১৫৬ ফুট), কোকতাং (২০১৬২ ফুট), জপুনো (২৫২৯৪ ফুট), কুম্ভকর্ণ (২৫২৮৮ ফুট), ফাক্রু (২৪২৯৫ ফুট), পান্ডিম (২২০১০ ফুট), এমন কী মাকালু (২৭৭৯০ ফুট) আর এভারেস্ট (২৯০৩৫ ফুট)-ও হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আপনাকে। একরাশ হিমেল হাওয়া ত্রস্ত পায়ে ছুটে এসে চুল এলোমেলো করে অভ্যর্থনা জানাবে আপনাকে।

এরপর হিল কাউন্সিলের ট্রেকার্স হাট, বনবিভাগের বাংলো, পি ডব্লুউ ডি বাংলো বা প্রাইভেট লজের যে কোনও একটিতে থাকার বন্দোবস্ত করে দুপুরের খাওয়া সেরে মনের সুখে ঘুরে বেড়ান সান্দাকফু-র আনাচে-কানাচে। দিন কেটে যাবে পাহাড় চূড়ায় মেঘ-রোদের লুকোচুরি খেলা দেখে। দিনের শেষে নীল সন্ধে ঘনাবে সান্দাকফুর বুকে, চাঁদ উঠবে। জোৎস্না পিছলে পড়বে বরফ পাহাড়ে, পাইনের ডালে, সান্দাকফুর মাথায়। মায়াময় চারিদিক! তারারা নেমে এসে মুখ দেখবে বরফের আয়নায়। হিমেল হাওয়া ঝাপ্টা মেরে ফিরতে বলবে আস্তানায়। বুখারির উষ্ণতায় গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জমাটি আড্ডায় কেটে যাবে সন্ধে, আসবে রাত্রি। শুনশান স্তব্ধ চরাচর, দূর থেকে হয়তো ভেসে আসবে কুকুরের ডাক। এই ভাবেই কেটে যাবে রাত। ভোরের আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়তে হবে সূর্যোদয় দেখার জন্য। হুড়োহুড়ি করে বেরোতে গিয়ে পিছলে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবু মধুর লাগবে এই পদস্খলন। চট জলদি উঠে আসুন সানরাইজ ভিউ পয়েন্টে। গিরিরাজের সবে ঘুম ভেঙেছে। বসে আছেন সূর্য স্নানের প্রতীক্ষায়। দিনমণি উদিত হয়ে বাহারি রঙ ঢালবেন এভারেস্ট, মাকাল, কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায়। তাদের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়বে রঙ। সকালের রোদ এসে মুছে দেবে সব রঙ। এমন সূর্যোদয় দেখা ভাগ্যের ব্যাপার, সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। হাতে যদি আরও সময় থাকে আরও ২০ কিলোমিটার হেঁটে ঘুরে আসুন ফালুট (৩৬০০ মিটার)। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সেখানে আরও নিবিড় করে পাবেন। না হলে, অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ফিরে চলুন রিম্বিকের পথে।

কোথায় থাকবেন

সারা পথেই ট্রেকার্স হাট আছে। সেখানে খাবার-দাবার, লেপ, কম্বল সবই মিলবে। এছাড়া সান্দাকফুতে আছে পি ডব্লুউ ডি বাংলো ও ইয়ুথ হোটেল এবং প্রাইভেট হোটেল। আর থাকার জন্য আছে DGHC-র Tourist Hotel, Kolkata বুকিং নং - ২২৮২১৭১৫, ট্রেকার্স হাট বুকিং-এর ঠিকানাঃ ৩/২, বিবাদি বাগ, কতকাতা-৭০০০০৬, ফোন - ২২৪৩৭২৬০

কীভাবে যাবেন

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং। দার্জিলিং থেকে বাস চলছে ২৫ কিমি দূরে মানেভঞ্জন। বাস ছাড়ে ৭.৩০ মিনিট ১২.৩০ ও ১ টায়। ১ ঘন্টা সময় লাগে। নিউ জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি থেকে একটি করে বাস আসে সান্দাকফুতে।

টুকরো খবর

ফলাফলের ঝড়

একের পর এক ফলাফলের প্রকাশ হল পশ্চিমবঙ্গ তথা আশপাশের রাজ্যগুলিতে। ফণীর দমকা ঝড়ে বদলে গেছিল পুরীর অবস্থা। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তথা লোকসভা ভোটের ফলাফল ফণীকে হার মানিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা গেল পূর্ব মেদিনীপুরের মহম্মদপুর দেশপ্রাণ বিদ্যাপিঠের ছাত্র সৌগত দাস ৭০০ নম্বরের মধ্যে ৬৯৪ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরই, জল্পনা সৃষ্টি হচ্ছিল লোকসভা ভোটের ফলাফল নিয়ে। এরপর লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশ হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রায় ৩৫০টির বেশি আসন পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামফ্রন্ট ধুয়ে মুছে গেলেও ভালো ফলাফল করেছে তৃণমূল। তারা প্রায় ২২টি আসন জিতেছে।

লড়াই যখন বেশ জোরদার, তখনই উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের ফলাফল হাতে পেয়ে গেছে।

প্রাপ্ত নম্বর দিয়ে জ্ঞান বিচার হয় না

মাধ্যমিকে পেয়েছিলেন দ্বিতীয় বিভাগ, এমনকি উচ্চ মাধ্যমিকেও যথারীতি ফেল, তবে বর্তমানে তিনি হলেন এক আই.পি.এস. অফিসার। ক্লাস ১২-এর পরীক্ষাতে ফেল করলেও কখনোই আই.পি.এস. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তাঁর এই ফলাফল। ঘটনাটি হল মুম্বই পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মনোজ শর্মাকে নিয়ে। যিনি বর্তমানে একজন আই.পি.এস. অফিসার। তাঁর স্কুল জীবনের প্রাথমিক ব্যর্থতা ও খুব সাধারণ ভাবে পাশ করার ঘটনা সমূহ নিয়ে তাঁর বন্ধু ডেপুটি কমিশনার অনুরাগ পাঠক আর কিছু দিনের মধ্যেই '12th Fail' নামে একটি বই প্রকাশ করতে চলেছেন। মনোজ শর্মা বলেছেন, 'স্কুল জীবনে কোনোদিন ভালো নম্বর পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। স্কুল জীবনের একটি পরীক্ষার ফলাফল কোনদিনই অদূর ভবিষ্যতের মাপকাঠি বাতলে দিতে পারে না।'

'12th Fail' বইয়ের লেখক অনুরাগ পাঠক বলেন, এই বইটি লিখে প্রকাশ করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ভীতি প্রকাশ করে তাদের ভয় কাটানোর জন্য। তিনি আরও বলেন, 'যদিও মনোজ শর্মাই আমার লেখার মুখ্য চরিত্র। তবুও আমি এমন কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করেছি যারা পড়াশোনা বা ক্লাসে ভালো ফলাফল না করতে পারলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারা।'

লড়াইয়ের সূচনা

৩০শে মে, ২২ গজের ময়দানে শুরু হয়ে গেছে ক্রিকেটের এক মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলাফল গোষণা হবে আগামী ১৪ই জুলাই। এই মহাযুদ্ধের নাম হলো আই.সি.সি. ক্রিকেট ওয়ার্ল্ডকাপ। যেখানে লড়াই হবে ১০টি দেশের মধ্যে। অংশগ্রহণকারী ১০টি দেশ হল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। এই ১০টি দেশ ৪৬দিন ধরে ৪৮টি ম্যাচ খেলবে শুধুমাত্র আই.সি.সি. ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের ট্রফিটি নিয়ে দেশে ফেরার লক্ষ্যে।

যে স্বপ্ন দেখে সেই একমাত্র স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগোতে পারে

স্বপ্ন শুধু দেখলেই হবে না, স্বপ্ন পূরণ করার ক্ষমতা তৈরী করতে হবে। একজন সন্তানের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ তার বাবা-মা, যারা সারা জীবন সব খারাপ অবস্থা থেকে নিজের সন্তানকে আগলে রাখবে।

একটা সন্তানের জন্ম ঘিরে সবার মধ্যে যেমন উত্তেজনা, উচ্চাকাঙ্খা থাকে, ঠিক তেমনই বাবা- মায়ের থাকে অনেক চিন্তা। কারণ তারা জানে তাদের দায়িত্ব বাড়তে চলছে, আর তাদের সব ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। বাবা-মায়ের চিন্তা বাড়ে যখন জন্মের আগে থেকেই গর্ভবতী মায়ের বা সন্তানের কোনও সমস্যা হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, জন্মের পর বাচ্চার কোনও অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞান উন্নত হয়ে গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই সদ্যোজাত শিশুর শরীরের ভেতরে বাড়তে থাকা রোগ আগের থেকে নির্ণয় করা যায় না। পরে রোগ ধরতে পারলেও সারা জীবন চিকিৎসকের ওপর ভরসা করে থাকতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে বাড়ির লোকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ফলে, অনেক শিশু অযত্নের শিকার হয়ে হারিয়ে যায় প্রতিবন্ধী তকমা পেয়ে। আবার কিছুক্ষেত্রে বাবা-মায়ের রুদ্ধশ্বাস লড়াই সেই অসুস্থ সন্তানকেই সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আজ এমনই একজনের কথা বলব, যাদের বাবা- মায়ের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের জন্যই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তাকে চেনে।

১৯৮৬ সালের জানুযারীতে জন্ম। বাড়ির দ্বিতীয়তম পুত্র সন্তান তিনি। জন্মের পরই ডাক্তাররা ক্ষমা চেয়ে তার বাবা-মাকে জানান, তাদের সন্তান ডাউন সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত। ফলে, সে কখনই আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতো জীবনযাপন করতে পারবে না। এই রোগটি হলে বাচ্চাদের বুদ্ধির বিকাশ এবং শারীরিক বৃদ্ধি কমে হয়ে যায়। রোগের কারণ হিসাবে জানা যায়, শরীরে থাকা ২১ নম্বর ক্রমোজমের নকল তৃতীয় ক্রমোজম তৈরী হওয়া।

সে বড় হওয়ার পর যখন স্কুলে ভর্তি হতে যায়, তখন এই অসুস্থতার সমস্যা জানার পরেই তার মাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেন, তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী শিশুদের কোনও স্কুলে ভর্তি করতে। তখন থেকেই তার মাকে সবক্ষেত্রেই লড়াই করতে হয়, তার ছেলে আর পাঁচটা শিশুর মধ্যে সুস্থ এটা বোঝাতে। তার ডাউন সিনড্রোম রোগ ছাড়াও একটা মানসিক সমস্যা ছিল, যার জন্য তার আনন্দ বা মন খারাপ হলেই সামনে থাকা মানুষটাকে আলিঙ্গন করত। এর জন্য স্কুলে প্রথমদিকে বাকি ছাত্রছাত্রীরা তাকে ভুল বুঝত ও তাকে নিয়ে মজা করত। কিন্তু সে এই বিষয়গুলো মনেই রাখেনি। তাকে যখন তার স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে বলে, 'স্কুল আমার কাছে খুব প্রিয় জায়গা, ওখানে গিয়েই প্রথম আমি শিখেছি, কিভাবে মনোযোগ দিতে হয়, পড়া মনে রাখতে হয়'। তার মনে, স্কুলের সেই দিনগুলো নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই। ছোটবেলা থেকেই সে সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেই ভালোবাসতো, আর তার জন্যই সে নিজের একটা রেঁস্তোরা খোলার চিন্তা করে। সেই মতোই কলেজে ফুড সার্ভিস নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে, তার বাবা মা তার জন্য একটি ঋণেরও ব্যবস্থা করে দেয়। তারপরই সে নিজের একটা রেঁস্তোরা খুলে ফেলে। সেই-ই প্রথম কোন রেঁস্তোরার মালিক যার ডাউন সিনড্রোম রোগ আছে। সেখানে খাবারের সাথে বিনামূল্যে মনভালো করার জন্য আলিঙ্গন করা হত। ৭৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে সে আলিঙ্গন করেছে। শুধু এইটুকুই নয়, স্পেশাল অলিম্পিকে গল্ফ খেলে সোনাও জিতেছে। তার নাম টিম হ্যারিস।

একদিন এক সেমিনারে তারই মতো একজন ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত একটি মেয়ের সাথে দেখা হয়, আর তার সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য তারা অন্য জায়গায় চলে যাবে বলে ঠিক করে। সেইজন্য তিনি তার রেঁস্তোরাটাও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি। তখন অনেকটাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন টিম। ঠিক সেইসময় তার বাবা-মা আবার সেই ছোটবেলার মতোই তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

টিম একটা কথায় খুব বিশ্বাসী 'ইফ ইউ ড্রিম ইট, ইউ ক্যান ডু ইট', মানে, যদি তুমি স্বপ্ন দেখতে পারো তাহলে সেই স্বপ্নও তুমি পূরণ করতে পারো। এরপরই তার নিজস্ব এনজিও 'বিগ হার্ট ফাউন্ডেশন' যা সবার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

টিম হ্যারিস শুধু নন তারা বাবা-মাও একইভাবে আমাদের অনুপ্রেরিত করে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নপূরণ করার এবং সব থেকে খারাপ সময়ও কাছের মানুষগুলোর পাশে থাকার।

স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলিং

মুখোমুখি বসে আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনেক সমস্যাই মিটে যায়। স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলার মনের গভীরে গিয়ে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে। এই প্রতিবেদন থেকে জেনে নেব তারা এত দক্ষতার সাথে কিভাবে এই কাজ করে।

প্রশিক্ষা আমাদের আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, বাড়ির বড়রা ছোট থেকেই এই কথাটাই বলে। কিন্তু কেন বা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেটা কি আমরা কেউ কখনও ভাবি। চলুন না আজ একটু ভাবি কি করে এমনটা হয়।

পরীক্ষার সময় দেখি আমাদের কিছু বন্ধুরা আছে, যারা কিনা বিভিন্ন বই পড়ছে একটা বিষয়ের জন্য। সেই বইগুলোতে হয়তো অনেক আলাদা কিছু নেই, হয়তো একটু শব্দের পার্থক্য আছে। প্রথমদিকে আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না, এটা করে কি হয়। সাধারণত, এইটা করলে আলাদা একটু ভাষা আর হয়তো একটু বেশি তথ্য পাওয়া যায়। তার জন্য লিখতে সুবিধা হয় বা লেখাটা অন্যরকম হয়।

এবার আপনি লেখাটা পড়ে ভাবছেন একটার সাথে একটার মিল কোথায়। মিলটা হল, শিক্ষা পড়ার বই ছাড়াও আরেকটা বইয়ের মতো। যেখানে নতুন শব্দের মতো, জীবনে নিজে এবং অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ পাওয়া যায়।

এই প্রতিবেদনের বিষয় হল স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলিং। আমরা কাউন্সেলিং শব্দটির সাথে কম বেশি অনেকেই পরিচিত। কাউন্সেলিং বিশেষত স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় হয় আর নয়তো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া রোগীদের মনোবিদরা কাউন্সেলিং করেন।

আমরা অনেকেই মনে করি ভগবান থাকলে শয়তানও আছে, এই চিন্তাভাবনা নিয়ে অনেক মতবিরোধ থাকলেও বিষয়টা খুবই সহজ। ভগবান বলতে শুধু ঈশ্বর বা শয়তান বলতে অসুর না ভেবে আমরা ভালোর সাথে খারাপের অস্বিত্ব আছে এটা ধরে নিতেই পারি।

কিন্তু মানুষের জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন ভালো খারাপ সব মিশে যায়, শুধু থেকে যায় একরাশ হতাশা। এরকম ঘটনা আমাদের আশেপাশে থাকা বিশেষত বয়স্ক মানুষদের মধ্যে এমনটি দেখা যায়। তখন স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলার বা মনোচিকিৎসকদের পরামর্শ মতো হতাশা ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া মানুষটিকে স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলিং করে আবার সাধারণ জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। রোগীর ভেতর আবার আত্মবিশ্বাস, ভরসা জাগিয়ে তোলাই এর মূল কাজ। স্পিরিচুয়াল মানেই তাকে ভগবান বা আল্লাহতে বা শয়তানে বিশ্বাসী করে তোলা নয়,

প্রকৃতির থেকে অতিরিক্ত শক্তিশালী কিছুই নেই, তাই নিজেকে ভালো রাখতে প্রকৃতির উপাদানগুলোর আরও কাছে পৌঁছাতে হবে, তার জন্য দরকার মেডিটেশন বা ধ্যান। স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলাররা এইভাবেই অনুপ্রেরিত করেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে।

স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলারের গুণাবলী

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন

স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলারের প্রথম ধাপই হলো, তাকে বুঝতে হবে ভবিষ্যতে কি হতে পারে। না, তাকে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে হবে না। কিন্তু সে যখনই রোগীর কাউন্সেলিং করবে তাকে মনে রাখতে হবে, সে যেন রোগীকে অন্ধবিশ্বাসী করে না তোলে। এমন কিছু না বলেন বা না করেন যাতে হিতে বিপরীত হয়।

নম্রতা

হতেই পারে রোগীর মানসিক অবস্থা এতটাই বিপর্যস্ত যে, সে কথা শোনার পরিস্থিতিতে নেই। তার মানে এই নয় যে, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন। তাকে শান্ত করাটা স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলারেরই কাজ।

পরিপক্কতা

রোগীর চিন্তাভাবনা আর আপনার চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সেটাকে আপনি কখনই ব্যক্তিগত পর্যায় নিয়ে যাবেন না। আর এটাই আপনার সবথেকে বড় পরিচয় হবে।

সমবেদনা

রোগীর জায়গায় দাঁড়িয়ে তার সমস্যাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাকে আপনি জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে পারেন না।

এই সব গুণগুলো একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে নাও থাকতে পারে। এর জন্য প্রথম থেকেই সাইকোলজি নিয়ে পড়তে হয়। যাতে স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলার হওয়ার সময় নিজের মধ্যে যেন কোনও খামতি না থাকে।

এবার জেনে নেওয়া যাক কোথায় কোথায় স্পিরিচুয়াল সাইকোলজি পড়ানো হয় ঃ

Amrita Darshanam - International Centre for Spiritual Studies
Amrita Vishwa Vidyapeetham
Amritapuri, Clappana P.O.,
Kollam, Kerala, India - 690 525.
Ph.- +91 476 2809400

Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (RKMVERI)
(Formerly Known as Ramakrishna Mission Vivekananda University)
P.O.- Belur Math
Dist.- Howrah-711202
West Bengal, India
Contact No.: (033)2654-9999

All India Institute of Occult Science
23, South Patel Nagar Market, Near Patel Nagar Metro Station Parking, South Patel Nagar, New Delhi, Delhi-110008
Ph.- 098719 23444

বিষণ্ণতা - কী করবেন, কী করবেন না

কয়েকটি বিষয় মেনে চললে বিষণ্ণ ব্যক্তিও ফিরে পেতে পারে স্বাভাবিক জীবন

বিষণ্ণতা আমাদের জীবন বিষিয়ে তোলে। অকারণে সৃষ্টি হওয়া বিষণ্ণতা বা তুচ্ছ কারণে অতিরিক্ত বিষাদময়তার কারণে নিজেকে মনে হতে পারে অযোগ্য, অকেজো, সহায়হীন, আশাহীন, সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাওয়া সব হারানো এক মানুষ। নানা রকম নেতিবাচক চিন্তা, ভগ্নহৃদয় আর উদ্যমহীনতার সঙ্গে যোগ হয় ভগ্ন স্বাস্থ্য, মৃত্যু চিন্তা পেয়ে বসে নিজেকে, কখনো বা আত্মহত্যা প্রবণ হয়ে ওঠে তীব্র বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তি। চিকিৎসকের সাহায্যে, ওষুধ সেবনে, পরিবার ও বন্ধুদের সহায়তায় আর সাইকোথেরাপির মাধ্যমে বিষণ্ণতা দূর করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি বিষয় মেনে চললে বিষণ্ণ ব্যক্তি ফিরে পেতে পারেন স্বাভাবিক জীবন।

যাঁরা কমবেশি বিষণ্ণতায় ভোগেন তাঁদের জন্য কয়েকটি টিপস

❑ যদি বিষণ্ণতার লক্ষণ নিজের মধ্যে দেখেন, তাহলে নির্ভরযোগ্য বন্ধু, স্বজনকে বিষয়টি জানান। যদি অন্য কেউ আপনার মধ্যে বিষণ্ণতার লক্ষণ খুঁজে পায়, তবে অযথা তাঁর দিকে আক্রমনাত্মক মনোভাব দেখাবেন না - তাঁর পর্যবেক্ষণকে গুরুত্বের সঙ্গে নিন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

❑ বিষণ্ণ অবস্থায় এমন কোনো লক্ষ্য স্থির করবেন না, যেটার বাস্তবায়নে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হয়।

❑ এই সময় নিজের কাছে বেশি কিছু আশা করবেন না। বেশি আশা করলে আশাভঙ্গের বেদনায় আরও বেশি বিষাদগ্রস্থ হবেন।

❑ স্বজন, বন্ধু আর সহকর্মীদের সঙ্গে সময় কাটান।

❑ নতুন বন্ধু তৈরি করুন। একা একা সময় কাটাবেন না।

❑ যে সব কাজ করতে আপনার ভালো লাগে সেই কাজেই নিজেকে নিয়োগ করুন।

❑ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যেকোনো কর্মকান্ডে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

❑ বিষণ্ণ অবস্থায় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না।

❑ নিজের ভেতরকার নেতিবাচক চিন্তাগুলোকে প্রশ্রয় দেবেন না, এগুলো বিষণ্ণতার অংশ - এগুলো বিষণ্ণতার সঙ্গে দূর হয়ে যাবে।

❑ ইতিবাচক চিন্তা নেতিবাচক চিন্তাকে দূরে করে। তাই ইতিবাচক চিন্তা ও পরিকল্পনা করুন।

❑ মৃত্যু চিন্তা আর আত্মহত্যার প্রবণতা থাকলে চেষ্টা করুন সবসময় স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে।

❑ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ খান। হঠাৎ করে ওষুধ বন্ধ করে দিলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

বিষণ্ণ রোগীর স্বজন-বন্ধুদের যা জানা প্রয়োজন

এসময় রোগীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্বজন ও বন্ধুদের সহায়তা। বিষণ্ণতার রোগীকে দূরে ঠেলে না দিয়ে তাঁর সুস্থতার জন্য করার আছে অনেক কিছু। এবিষয়ে যে বিষয়গুলো বেশি মনে রাখতে হবে তা হল -

❑ আপনার কোনো নিকটজনের মধ্যে বিষণ্ণতার লক্ষণ দেখা গেলে, তার কাছ থেকে বিষণ্ণতার কারণ জানুন এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান।

❑ মানসিক চিকিৎসকের কাছে নিজের স্বজন-বন্ধুকে নিয়ে যেতে ইতস্তত করবেন না। মনে রাখবেন, শুরুতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

❑ চিকিৎসকের উপদেশ মেনে চলার বিষয়ে রোগীকে সর্বতোভাবে উৎসাহ দিতে হবে।

❑ বিষণ্ণ রোগীকে মানসিকভাবে ভরসা দিন এবং তাঁর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলুন এবং ভালোবাসুন।

❑ আত্মহত্যা বা মৃত্যু সংক্রান্ত তাঁর যে কোনো মন্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে নিন। এ ধরনের প্রবণতা সম্পন্ন রোগীকে একা থাকতে দেবেন না।

❑ রোগীকে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে উৎসাহিত করুন। প্রয়োজনে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

❑ অনেকের ভুল ধারনা আছে, যেকোনো মানসিক সুস্থতার জন্য রোগীকে বিয়ে দিয়ে দিলে বা পড়া লেখা বা চাকরির জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিলে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন - এই ধরনের ঝুঁকি পূর্ণ কাজ কখনোই করবেন না।

❑ বিষণ্ণতার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক ও রোগী দুজনকেই সময় দিন। হুট করে বিষণ্ণতা ভালো হয়ে যাবে এমনটা আশা করবেন না। ধৈর্য ধরুন। অনেক সময় দেখা যায়, কেবল রোগীর স্বজনদের অস্থিরতা ও অধৈর্যের কারণে চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়। চিকিৎসক, রোগীর স্বজন, বন্ধু সহ সবার সদিচ্ছায় বিষণ্ণতায় আক্রান্ত রোগী ফিরে পেতে পারে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন।

গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বাঁচতে প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষের মন চাইছে বর্ষা

‘মন মোর মেঘেরও সঙ্গী উড়ে চলে দিকদিগন্তের পানে...’ বর্ষা শুধু প্রকৃতির পরিবর্তনই আনে না, তার সাথে মানুষের মনের ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশেরও পরিবর্তন নিয়ে আসে।

‘‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেবো মেপে...’’ ছোটবেলার এই কবিতা আর বৃষ্টির সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই অজস্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কখনও কাগজের নৌকা বানিয়ে বৃষ্টির জলে ভাসানো কিংবা স্কুল থেকে ফেরার সময় বন্ধুদের সাথে জলের মধ্যে লাফালাফি করে পুরো কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফেরা অথবা বৃষ্টি ভেজা মাঠে বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলতে গিয়ে পুরো কাদা মাখামাখি হয়ে যাওয়া। না-জানে আরও কত না কত বৃষ্টি ভেজা দুপুরের গল্প আজও রয়ে গেছে আমাদের মনের কোণে। চোখ ঝলসানো সূর্যের তেজ আর তীব্র তাপপ্রবাহের পর যখন আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম জলীয় বাতাসের প্রভাবে জুন মাসের শুরুতে কেরলে যখন বর্ষা ঢোকে তখন মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখি, গাছপালা সকলেই প্রাণ ফিরে পায়। জুন মাসে দক্ষিণ ভারত তথা কেরলে বর্ষা চলে এলেও পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার আগমন হয় জুনের শেষে কিংবা জুলাইয়ের শুরুতে। প্রায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ জুড়ে চলে বর্ষাকাল। এই বর্ষাকালে কিছু মন জুড়ানো ফুল যেমন কামিনী, বেল, জুঁই, কৃষ্ণচূড়া, দোপাটি, বাদল ফুল, লিলি, কদম, সূর্যমুখী ইত্যাদি নানান ধরনের ফুল ফুটতে দেখা যায়। শুধু ফুলই নয় এই বর্ষাকালে জিভে জল আনা কিছু ফলও পাওয়া যায়, যেমন- জামরুল, আনারস, কালোজাম, বেদানা, কলা, আপেল, ন্যাসপাতি, পেয়ারা ইত্যাদি। এছাড়া লাউ, কাঁকরোল, ঢ্যাঁড়স, পটল, ঝিঙে প্রভৃতি নানান ধরণের সবুজ সবজী বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র আর তীব্র তাপপ্রবাহের ফলে যখন পুকুর-নদী-নালা সবই প্রায় শুকিয়ে যায় তখনই বর্ষার জল পেয়ে সেই সকল পুকুর-নদী-নালা ফুলে ফেঁপে ওঠে। তীব্র গরমে যেমন খরা দেখা যায়, অনেক সময় চাষেরও অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, ঠিক তেমনই প্রবল বৃষ্টির ফলে নদীর উচ্চ জলোচ্ছাসের ফলে বহু গ্রাম ভেসে যায়, ভিটে ছাড়া হয় বহু মানুষ। শুধু তাই নয় একটানা প্রবল বৃষ্টির ফলে অনেক গ্রামেই দেখা যায় কলেরা, ডায়ারিয়া ইত্যাদি নানান ধরণের মহামারী। এমনকি একটানা প্রবল বৃষ্টির ফলে মানুষ আর গবাদি পশুরা একই জায়গায় আশ্রয় নেয়। শুধু তাই নয়, বন্যায় আক্রান্ত গ্রামগুলির মানুষদের বাঁচানোর জন্য ত্রাণেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই সবকিছুর মাঝেই রয়েছে বর্ষাকালের মূল আকর্ষণ ইলিশ মাছ, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম - Tenualosa ilisha। বাঙালির বর্ষাকাল মানেই খিচুড়ি দিয়ে ইলিশ মাছ ভাজা, ডিম ভাজা, চাটনি, পাঁপড় আর মিষ্টি। শুধু ইলিশ মাছ যে খিচুড়ি দিয়ে ভাজাই খাওয়া হয় এমনটা একদমই নয়। সর্ষে দিয়ে ইলিশ ভাপা, কুমড়ো-বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল আর নানান ধরণের জিভে জল আনা ইলিশ মাছের পদ বাঙালী খেয়ে তাকে এই বর্ষাকালে। ইলিশ প্রধানত নোনা জলের মাছ হলেও সাধারণত বর্ষার শুরুতে যে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হয় তখনই ইলিশ মাছ নদী মোহনায় আসে ডিম পাড়তে, আর তখনই জালে আটকা পড়ে রুপোলি এই মাছ। আর এই ধরণের বৃষ্টিকে বলা হয়ে থাকে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি। এই বর্ষাকলে সারা ভারতের প্রায় সকল প্রান্তের মানুষই উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন। এই সকল উৎসবের মধ্যে আমাদের সকলের মনে যে উৎসবের কথা সবার আগে আসে তা হলো জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। পুরীর জগন্নাথদেব এই সময় ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে নিয়ে রথে করে তাঁর মাসি বাড়ি যান আর সেখানে সাতদিন থেকে জগন্নাথদেব ভাই ও বোনকে নিয়ে রথে করে আবার মূল মন্দিরে ফিরে আসেন। জগন্নাথদেবের এই রথ যাত্রা দেখতে সারা ভারত এমনকি বিদেশ থেকেও অসংখ্য ভক্ত এসে উপস্থিত হন উড়িষ্যাতে। এছাড়া আরেক উল্লেখযোগ্য উৎসব হলো রাখীবন্ধন যা এই বর্ষাকালেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া মহারাষ্ট্রের গণেশ চতুর্থী; রাজস্থানের তেজ; কেরলের ওনাম; মথুরা, বৃন্দাবন ও মহারাষ্ট্রে জন্মাষ্টমী; লাদাকের হেমিস উৎসব; মেঘালয়ে বেহদিয়েনখলাম; গোয়াতে সাও জোআও; তামিলনাড়ুতে আদিপেরুক্কু; এছাড়া সারা ভারতবর্ষ জুড়েই চলে গঙ্গা দর্শন আর সেই দর্শন ঘিরে নানান পণ্যসামগ্রীর মেলা।

অতএব এক কথায় বলা যায়, তীব্র গরমের পরে বর্ষার আগমন শুধুই যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন এনে দেয় এমনটা নয়, প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষের মন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটায়।

অ্যালোপ্যাথির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই হবে রোগমুক্তি !

সামান্য অসুস্থ বোধ করলেই মুঠো মুঠো ব্যথানাশক অ্যালোপ্যাথি খেয়ে সাময়িক স্বস্তি পেলেও তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যে অভাবনীয় যা বর্তমানে চোখে না পড়লেও ভবিষ্যতে আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলবেই। তাই অ্যালোপ্যাথির ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে সঙ্গী করুন হোমিওপ্যাথিকেই।

দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝে যেমন খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম হয়, ঠিক তেমনই সময়ের অভাবে আমাদের শরীরও অবহেলিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই কাজের চাপের মাঝে যদি কখনও আমদের সামান্য মাথাব্যথা কিংবা পেটে-ব্যথা হয় অথবা আমরা যদি কোনো কারণে দুর্বল বোধ করি বা অসুস্থতা বোধ করি তখন আমরা অনেকেই হুটহাট করে ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে থাকি কারণ ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকলে তো চলবে না, আর তাছাড়া সময়ের মধ্যে কাজও তো শেষ করতে হবে। এই কাজটি করে আপনি হয়তো সাময়িক ভাবে সুস্থ বোধ করছেন কিন্তু ওই মুঠো মুঠো ব্যথানাশক অ্যালোপ্যাথির ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াতে আপনার শরীরের অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে যা আপনি এখন বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে তা ঠিকই টের পাবেন। তাই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন ওই সকল অ্যালোপ্যাথি ওষুধ বাদে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম জেনে নেওয়া যাক যা বর্তমানে আপনাকে সুস্থ করে তুলবে অথচ ভবিষ্যতের জন্য কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকবে না। আসুন জেনে নেওয়া যাক মাথাব্যথা ও সর্দি-কাশিতে উপযুক্ত ও সহজলভ্য কিছু ওষুধের নাম-

আর্সেনিক অ্যালবাম

যদি কখনও ঘন ঘন গলা ব্যথা, বুকে জ্বালা বা ব্যথা, দুর্বলতা, অস্থিরতা এবং উদ্বেগ অনুভব করেন তাহলে আর্সেনিক অ্যালবাম সেবনে আপনি আরাম বোধ করবেন। তাছাড়া শরীরের বাকি অংশ ঠান্ডা এবং মাথা গরম কিংবা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, অকারণেই হাঁচি হওয়ার ক্ষেত্রেও এই ওষুধ খেতে পারেন।

নাক্স ভোমিকা

অতিরিক্ত নাক শুষ্ক হয়ে যদি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয় এবং গন্ধ অনুভব না করতে পারলে সেক্ষেত্রে নাক্স ভোমিকা হলো যথাযথ প্রতিকার।

নাট্রাম মুরিয়াটিকাম

মাথা ব্যথা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে ঠোঁট ফাটা ও ঠোঁটের চারপাশে ফোঁড়া হলে সেক্ষেত্রে নাট্রাম মুরিয়াটিকাম উপযুক্ত ওষুধ।

বিষকাঁটালি

ঘাম থেকে হওয়া জ্বরের ক্ষেত্রে বিষকাঁটালি খুবই উপকারী ওষুধ।

ইউফ্রেসিয়া

চোখ লাল হয়ে জ্বালা করা, ঘন ঘন নাক থেকে জল পড়া প্রভৃতি এই ধরনের উপসর্গ থাকলে ইউফ্রেসিয়া খুবই উপকারি প্রতিকার।

অ্যানোনিটাম ন্যাপিলাস

তীব্র গরমে ত্বক ও মুখ শুকিয়ে যাওয়া থেকে হঠাৎই জ্বরের সূত্রপাত হলে অ্যানোনিটাম ন্যাপিলাস এইক্ষেত্রে যথাযথ ওষুধ।

ডুলকামারা

ঘামে ভিজে বা ঠান্ডা লেগে যদি জ্বর আসে আর সেই সাথে নাক দিয়ে জল পড়া ও শুষ্ক কাশি হয় তাহলে ডুলকামারা খেলে রোগ থেকে মুক্তি পাবেন।

জেলসেমিয়াম

চোখের পাতা ভারি হয়ে যাওয়া, মাথাব্যথা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দুর্বল বোধ করলে খেতে পারেন জেলসেমিয়াম।

ক্যালি বিক্রমিকাম

কাশির সাথে যদি বুকে কফ্ বসে গিয়ে থাকে তাহলে ক্যালি বিক্রমিকাম খেলে রোগ নিরাময় হবে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

দ্রাবক মারকিউরিস

তীব্র জ্বরের সাথে মাথা ব্যথা, গা-হাত-পা ব্যথা, রাতে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া আর সেই সাথে কাশি, নাক বন্ধ, বুকের যন্ত্রণা হলে দ্রাবক মারকিউরিস হলো এই ক্ষেত্রে মুখ্য প্রতিকার।

ক্যালি মিউরিটিকাম

ঠান্ডা লাগার ফলে যদি কান বন্ধ হয়ে যায় আর সেই সাথে কানে যন্ত্রণা ও কম শোনার মতো সমস্যা দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে ক্যালি মিউরিটিকাম হলো যথাযথ প্রতিকার।

তবে উপরে যে ওষুধগুলোর বর্ণনা দেওয়া আছে, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই পরিচয়কে ভিত্তি করে কেউ কোনো ওষুধ নিজে নিজে সেবন করবেন না। সঠিক ওষুধ সঠিকভাবে খেয়ে উপকার পেতে, অতি অবশ্যই কোনো অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্য নেবেন।

সুস্বাস্থ্য পেতে ছাড়তে হবে যে লোভনীয় বদ অভ্যাসগুলো

অনেক ধরনের বদ অভ্যাস আমাদের আনন্দ দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই বদ অভ্যাসগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের বড় ধরনের ক্ষতি করে। কী ধরনের সেই অভ্যাসগুলো হতে পারে তা জেনে নিন এই প্রতিবেদন থেকে।

অনেক ধরনের বদ অভ্যাস আমরা বেশ আনন্দ নিয়েই লালন করে থাকি। কারণ একটাই, অভ্যাসগুলো অনেকাংশেই আমাদের টানে। আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই জানি এই অভ্যাসগুলো খারাপ, তারপরও কাজগুলো করার আকর্ষণ সামলে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু এইসব অভ্যাসের ফলাফল কী ভালো হয়? বর্তমানে তেমন কোনো বড় ধরনের ক্ষতি না হলেও পরবর্তীতে এই অভ্যাসগুলোর জন্য অনেক ক্ষতি হবে আপনার স্বাস্থ্যের।

অনেক ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য এই বদ অভ্যাসগুলোই দায়ী। এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে এই বদ অভ্যাসগুলোর ফলাফল! যতই লোভনীয় ও আকর্ষণীয় হোক না কেন এই বদ অভ্যাসগুলো অতি দ্রুত ত্যাগ করা প্রয়োজন। বদলে ফেলুন এই জাতীয় সকল বদ অভ্যাস।

ফাস্ট ফুডের আসক্তি

ফাস্ট ফুড জিনিসটি অবশ্যই সুস্বাদু। কিন্তু তাই বলে ঘন ঘন ফাস্ট ফুড খাওয়া মোটেও ঠিক নয়। ফাস্ট ফুড খাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করার ফলাফল পুরোটাই স্বাস্থ্যের ওপর পড়ে। হয়তো ১/২ সপ্তাহে এর মাত্রাতিরিক্ত ফ্যাটের কাজ নিজের দেহে দেখতে পাবেন। কিন্তু দেহে জমা হওয়া কোলেস্টেরলের ফলাফল দেখতে না পেলেও পরে ঠিকই টের পাবেন। ইদানিং অনেক কম বয়সী নারী ও পুরুষকে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের কবলে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এর মূল কারণ ফাস্ট ফুডে আসক্তি। সুতরাং এই অভ্যাসটি বদলে ফেলুন।

অতিরিক্ত টিভি ভক্তি

হাতে কিছু ভাজাপোড়া নিয়েই টিভির সামনে সোফায় শুয়ে-বসে কাটাতে পছন্দ করেন অনেকেই। সময় পেলেই চিপস বা অন্যান্য স্ন্যাক্স নিয়ে টিভি দেখতে বসে যান। কিন্তু আপনি জানেন কি, এমনটা করে আপনি আপনার হার্ট ও চোখের কত বড় ক্ষতি করে চলেছেন? যাঁরা টিভি বেশি দেখেন তাঁদের হার্ট অ্যাটাক, চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি, স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এই কাজটি করা থেকে বিরত থাকুন।

রাত জাগা বা রাতে দেরি করে ঘুমানো

মধ্য বয়সীদের অফিসের কাজের চাপ এবং তরুণদের ফেসবুক বা ফোনে কথালাপে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়। অনেকেই নানান কারণে আবার অনেকেই বিনা কারণে রাত জাগা ও দেরি করে ঘুমানোর অভ্যাস পরিণত করে ফেলেছেন। কিন্তু ডাক্তারদের মতে, দৈনিক ৬-৮ ঘন্টা টানা না ঘুমিয়ে আপনার নিজেরাই দেহের ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে ফেলেছেন। ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হলে যে কোন রোগে দ্রুত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাত ১২টার মধ্যে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। রাত জাগা বা দেরি করে ঘুমানোর অভ্যাস বদলে ফেলুন।

সামান্য কিছুতেই ওষুধ খাওয়া

সামান্য মাথা ব্যথা কিংবা পেটে ব্যথা হলেই অনেককেই হুটহাট ব্যথানাশক ওষুধ খেতে দেখা যায়। এই কাজটি করা বন্ধ করুন। বেশির ভাগ ব্যথানাশক ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বেশ ভয়াবহ হয়। সুতরাং ডাক্তারের সাথে পরামর্শ না করে কোন প্রকার ওষুধ খাবেন না।

কানে সবসময় হেডফোন গুঁজে রাখা

দিনে-রাতে অবসর সময়ে কিংবা কাজের মাঝে আবার কোথাও বেড়াতে বেরোলে অনেকেই হেডফোনে গান শুনতে থাকেন। এটা বেশ_ক্ষতিকর আপনার কানের জন্য। এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই আপনার কানে শোনার সমস্যা সহ ব্রেইনের ক্ষতি পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং গান শুনুন কিন্তু বেশি জোরে নয় এবং অল্প সময় ধরে।

ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ না করা

ছোটবেলার এই বাজে অভ্যাস বড় হওয়ার পরও অনেকে বদলান না। আলসেমি করে রাতে বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়েন। দাঁত মাজাকে বেশি গুরুত্ব দেন না অনেকেই। কিন্তু এতে আপনি আপনার মুখে ব্যাকটেরিয়ার খাবার জন্য অনেক কিছুই রেখে দেন এবং ব্যাকটেরিয়া খাবারের সাথে সাথে আপনার দাঁতের ওপরও হামলা চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, দাঁতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। সুতরাং, ঘুমানোর আগে অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করবেন।

Madhurima PRINTERS

House of Complete Printing Solutions

All Kinds of Commercial Designing & Printing

FLEX • DIGITAL • OFFSET • T-SHIRT • MUG PRINT

17 Pataldanga Street, Kolkata-700009

Ph.: 87776 21552 / 91430 75675

E: madhurimaprinters@gmail.com

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বিহেভিয়ারাল সায়েন্স-এর পক্ষে ডা. কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পি-৭ সি আই টি রোড, মৌলালি, কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে 'অ্যাঞ্জেল' প্রকাশিত ও মুদ্রিত ● মধুরিমা প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ● ফোনঃ ২২৮৬-৭০৩৮, E-mail: angelpublishers@gmail.com ● **সম্পাদক ঃ কেদার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** ● RNI No. WBBEN/2009/34317